আ ল বে রু নী

আলবেরুনী

সত্যেন সেন

ভূমিকা
কাজী মোতাহার হোসেন

শব্দাঙ্গন

শব্দশৈলী প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪

আলবেরুনী
সত্যেন সেন
ভূমিকা : কাজী মোতাহার হোসেন

প্রচ্ছদ : আল নোমান

© লেখক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-984-98852-0-7

শব্দাঙ্গন-এর পক্ষে ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৭৭৬২৪০৯০ থেকে ইতিয়া আমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল কাদের প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত। বর্ণ বিন্যাস- শব্দশৈলী কম্পিউটার।

একমাত্র পরিবেশক : শব্দশৈলী, ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : ০২-২২৬৬৩৭৯০৫

AL-BIRUNI
By
Satyen Sen

Published by Eitiya Amin
Shobdanggon, 38/4, Banglabazar Dhaka-1100
অনলাইলে পেতে : www.facebook.com/shobdoshoily
ই-মেইল : shobdanggon2020@gmail.com
অথবা ফোন করুন: 16297

মূল্য : ৫০০ টাকা
$: 10

সেজদা ও প্রতিমা বউদিকে

ভূমিকা

মধ্য যুগের মুসলিম গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে খারিজমী, আলবেরুনী, আবূ সিনা, আল হাজেন্, ওমর খাইয়াম, জাবির ইত্যাদির নাম বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে আলবেরুনীর বিশেষত্ব হল, ইনি আরবি, ফার্সি, গ্রিক, হিব্রু, অরামীয় ছাড়া সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। এমন একজন প্রতিভাবান ও মানবদরদী বৈজ্ঞানিকের জীবনাদর্শ ও চরিত্রকে লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অতি মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবু রায়হান আলবেরুনী কেমন জ্ঞান-পাগল কেতাবপড়ুয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় প্রথম পর্বেই পাওয়া যায়, – যখন তিনি কেতাবের পোঁটলা নিয়ে জুরজানের পথে চলবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়েন ঐ পোঁটলাটা বাঁচাবার জন্য ক্লেশ ও নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। আর ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে মানুষের মনে যে কত বিচিত্র ধারণা রয়েছে তারও পরিচয় পাওয়া যায় এ-বইয়ের সর্বত্র — ডাকাতের মুখে, রাজদরবারের আলেমদের শিক্ষা ও উপদেশদানের মধ্যে– আরব,
পারস্য, গ্রিস, রোম ও হিন্দুস্তানের বিদ্বজ্জনের কথাবার্তার মধ্যে।

মানুষের মনে সহজেই পুরাতন বা সনাতন জ্ঞান পাথরের মত শক্ত হয়ে স্থিতি লাভ করে। যে-সব সাহসী লোক সেই স্থিরতা সম্প্রসারণ করতে যান, তাঁরা রক্ষণশীলদের এবং তাদের দল-বলের কাছ থেকে প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সবের জন্য কত রকমের যে যুক্তি-তর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ সংগ্রামের ভিতর দিয়েই জ্ঞানের উন্নতি হয়। মানবপ্রকৃতির এই স্থবিরতা ও

জঙ্গমতার মধ্যে রাশ টেনে ধরবার জন্য কাজ করেন উদার প্রকৃতির পরমত-সহিষ্ণু ব্যক্তিরা। সমাজে বাস করতে হলে কিছুটা আপোস না করে উপায় নেই। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রবলের সঙ্গে আপোস করে কত মনঃকষ্টে ও সতর্ক ভাবে আলবেরুনীকে চলতে হয়েছে বর্তমান লেখক সে সবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, আর কী সূক্ষ্ম নৈতিক সততার সঙ্গে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বিচার করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এঁর মনে জ্ঞানের অহঙ্কার নেই, ইনি সর্বদা সকলের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করতে উৎসুক; আবার পাত্র অনুসারে যথাযোগ্য জ্ঞান দান করতেও উদগ্রীব। এঁর মনে হিন্দু মুসলিম বা আরবি-ইরানি-গ্রিক-হিন্দুস্তানি জ্ঞানেরম মধ্যে পার্থক্য নেই, জ্ঞান জ্ঞানই, যেখান থেকে পাওয়া যায় সেখান থেকেই গ্রহণ করতে হবে। আর বাহ্যত নৃশংস অত্যাচারী সুলতানদের মনেও যে জ্ঞান-লিপ্সা ও মহৎভাব লুকিয়ে থাকে, কেউ যে নিছক ভাল বা নিছক মন্দ নয়, ভাল-মন্দ অনেকটা বাস্তব পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, আলোচ্য উপন্যাসে এসব চিন্তার বহু উদাহরণ রয়েছে।

যেমন জুরজানের কম সুলতানের সঙ্গে কথোপকথন:

সুলতান— আপনি বলছেন রাজা প্রজাদের প্রতিনিধি। কিন্তু যাকে প্রতিনিধি বলছেন, তিনি ভালমন্দ যাই করুন না কেন, তার উপর কোনো কথা বলবার অধিকার তাদের নাই- সে যোগ্যতাও নাই।

আ.বে.- মুসলিম জগতের আদর্শ যাঁরা, সেই খোলাফায়ে রাশেদীন কিন্তু (নিজেদেরকে) প্রজাদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করতেন। শুধু মনে করা নয়, সেই ভাবেই তাঁরা জীবনযাপন করে গেছেন। আপনি নিশ্চয় তাঁদের কথা জানেন।

সুলতান- হ্যাঁ জানি। কিন্তু তাঁদের আদর্শ শেষ পর্যন্ত আদর্শই থেকে গেল, বাস্তবে টিকে থাকতে পারল না। তাঁদের আমল শেষ হবার পর উম্মীয় বংশের রাজত্বের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কি আরব, কি মিশর, কি স্পেন, এ

আদর্শ কোথাও টিকে থাকতে পারল না। যা অচল তা চলে না, যা ভঙ্গুর তা ভাঙবেই।

২. খারিজমের সুলতান মামুনের সঙ্গে কথোপকথন:
আ.বে. আপনি আর সবার চেয়ে আমার প্রতি অনেক বেশি অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, সেজন্য আমি মনে মনে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করি। অন্যেরাও হয়তো এ জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হয়। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সুলতান- আচ্ছা আপনার কাছে একটা প্রশ্নঃ আমার ধারণা ছিল জ্ঞান মানুষের মনকে প্রসারিত করে, উদার করে এই ধারণা কি ভ্রান্ত?
আ.বে.- কেন, এ কথা বলছেন কেন?

সুলতান- আমার দরবারে যে সমস্ত আলেম আছেন তাঁরা সবাই জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে এমন সঙ্কীর্ণচিত্ততা এবং পরস্পর সম্পর্কে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পরিচয় পাই, তাতে স্তম্ভিত হয়ে যাই। বড় দুঃখও পাই। ...এসব [এমন] কথা কারু কাছেই [মন] খুলে বলা যায় না, মনে মনেই হজম করতে হয়।... আজ হঠাৎ বলে (আপনার কাছে) ফেললাম।

আ.বে.- আমরা মানুষ, বড় থেকে ছোট সবাই রক্তেমাংসে গড়া, সবাই অল্পবিস্তর দুর্বলতার অধীন। সেই জন্য পরস্পরকে যতটা সম্ভব ক্ষমা করতে শেখা উচিত।
সুলতান– উহু, আপনি এড়িয়ে গেলেন। এ ক্ষমা করা, না-করার প্রশ্ন নয়। আমার জিজ্ঞাসা, এ কেমন করে হয়? কেন হয়?

আমি জানি নে, এই সংলাপগুলো কি আলবেরুনীর নিজের রচনা, না গ্রন্থকার আলবেরুনীর জীবনচরিত ভাল করে পড়ে, আত্মস্থ করে নিজের মত করে এইভাবে করতে পেরেছেন। যদি শেষের অনুমানটাই ঠিক হয়, তাহলে আমি একে মনে করব অসাধারণ কৃতিত্ব। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দক্ষ নাট্যকারের মত ভিনদেশীয় নাটকীয় চরিত্র এমন নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলার মত সাহিত্যিক এ পর্যন্ত নজরে পড়েনি। তাইতেই আমার মনে হয়েছে বইখানা ঠিক হুবহু

অনুবাদ তো নয়ই— কারণ, এমন স্বাভাবিক চমৎকার বাংলায় ইংরেজি বা অন্যভাষা থেকে অনুবাদ করাও অতিশয় দুরূহ কাজ। তাই, আমার বিশ্বাস, লেখক বহু দিন ধরে, বহু পরিশ্রম করে অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপার আত্মসাৎ করে ঘটনা কিছু সংক্ষিপ্ত করে, মূল সংলাপগুলোর মর্ম ঠিক রেখে অনুবাদ করেছেন।

লেখক এ-বইয়ের মারফতে এমন একজন মহা-ব্যক্তিত্বশীল সাহিত্যিক, ভাবুক ও লোকপ্রেমিককে বাংলা পাঠকদের কাছে পরিচিত করে দিচ্ছেন যে, এই কাজটাকে আমি অশেষ পুণ্যের কাজ বলে মনে করি। আশা করি, পাঠকসমাজ এ-বই পড়ে আনন্দ পাবেন আর আত্মোন্নতির মত মহৎ ফলও পাবেন।

আমি গ্রন্থকারকে সানন্দ অভিবাদন জানাই।

কাজী মোতাহার হোসেন
৩০শে মার্চ, ১৯৬৯

আলবেরুনী ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর চরিত্র ও ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক কিছুই কল্পনাপ্রসূত। তবে আলবেরুনীর জীবনের ঐতিহাসিক কাঠামো ও পটভূমিকাকে, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, সঠিক ভাবে অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছি। অনেক ভুল-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধক আবু রায়হান আলবেরুনীর দেশ, জাতীয়তা ও ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত অদম্য জ্ঞানপিপাসার কিছুটাও যদি ফুটিয়ে তুলতে পেরে থাকি, তা হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব। বইটি কোনো বিদেশি উপন্যাসের অনুবাদ বা অনুসরণে লেখা নয়। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসে এই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলাম। সেজন্য যথোচিত পরিমাণ-মসলা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই সময় এম. আকবর আলী সাহেবের ‘বিজ্ঞানে মুসলমানের দান’ নামক মূল্যবান গ্রন্থটি আমার এই উপন্যাস রচনার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। দু-এক জায়গায় আরবি থেকে অনূদিত অংশ বিশেষ, বিশেষ করে আবু সহলের কাছে লেখা আলবেরুনীর অপূর্ব চিঠিখানি প্রায় যথাযথভাবেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই ঋণ স্বীকার করছি।

-সত্যেন সেন

আল বেরুনী

এক

দিনের পর দিন নিরাশ্রয় হয়ে পথে-বিপথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আশ্রয় জুটল। এত বড় সৌভাগ্য যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, এটা আলবেরুনীর পক্ষে আশার অতীত। জন্মভূমি খারিজম রাজ্য ছেড়ে চলে আসবার পর থেকে বহু দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা আর অপমান সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। মাত্র একটা পেট, কিন্তু সময়-বিশেষে তার চাহিদা মেটানোও কঠিন হয়ে ওঠে। অজানা-অচেনা বিদেশি মানুষ, চোর, জুয়াচোর, গুণ্ডা বা বদমাইশ যে নয়, তারই-বা প্রমাণ কী? কেউ কেউ সন্দেহ করে ঠাঁই দিতে চায় না। জায়গা যদি-বা জোটেও, দু'একদিন পরেই আখেরি কথা শুনতে হয়- এবার তুমি তোমার পথ দেখ বাছা। পথ? পথে তো পড়েই আছে অবারিত, কিন্তু একটা মানুষ, তার একটা মাথা বাঁচাবার মত জায়গা চাই তো!

কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে, জওয়ান মরদ মানুষ তুমি, এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াও কেন? তোমার পেশা কী? কী কাজ জান তুমি? ভাল মানুষের মত এক জায়গায় থিতু হয়ে বসে তাই কর না কেন, আল্লাহ্ হাত-পা দিয়েছেন খেটে খাবার জন্য। মেহনত না করলে দেনেওয়ালা নারাজ হন। কই, তোমাকে তো কোনো কাজ করতে দেখি না।

সত্যি কথাই। শরীর খাটিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন কোনো দিন হয়নি। কাজেই সে-বিদ্যা তাঁর একেবারেই আয়ত্তে নয়। ধনীর সন্তান নন, তার উপর অল্প বয়সে বাপ-মাকে হারিয়েছেন। কিন্তু তা হলেও খাওয়া-পরার সমস্যা নিয়ে কোনো দিনই তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়নি। খারিজমের সুলতানের অনুগ্রহে তিনি বাল্যকাল থেকে সুখে-স্বাচ্ছন্দে প্রতিপালিত। তাঁরই অনুগ্রহে তিনি শিক্ষা লাভ করবার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে থাকবার সুযোগ পেয়েছেন। পৃথিবীর এই রুক্ষ মূর্তিটা কোনোদিনই তাঁর নজরে পড়েনি।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ এই ভ্রাম্যমাণ অস্থির জীবনে লেখাপড়ার সুযোগ একেবারেই নেই। অথচ মানুষের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ। যে সময় চলে যায়, একেবারেই চলে যায়। সেই ক্ষতি সামলে নেবার উপায় নেই। হারিয়ে ফেলা সময়গুলি নিয়ে আলবেরুনীর মনস্তাপের অবধি নেই।

অবশেষে সমস্ত সমস্যার অবসান হয়ে গেল। জুরজানের সুলতান কাবুস্ বিন ওয়াশমগীর এলেমের কদর বোঝেন। এ বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ তাঁর। তিনি আলবেরুনীকে তাঁর নিজের সভায় সাদরে আশ্রয় দিলেন।

যোগাযোগটা বিচিত্র। সেদিন কোথাও কোনো আশ্রয় জোটেনি। খাঁ খাঁ করছে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। সারাদিন হাঁটছেন, কিন্তু কোথাও কোনো জনপদের চিহ্ন নেই। ক্ষুধা আর পথশ্রান্তিতে পা আর চলতে চাইছে না। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল, ঝাপসা হয়ে এল চারদিক। এই অজানা দেশে অন্ধকার পথে আর বেশি এগোনো নিরাপদ নয়। মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। খুব বেশি দিনের কথা নয় তো। সেদিনও ঠিক এমনিভাবে সন্ধ্যার পরে আশ্রয়ের সন্ধানে পথ চলছিলেন। চলতে চলতে হঠাৎ একটা আলো দেখতে পেয়ে আশায় ভরে উঠল মন। আলো মানে মানুষের বসতি, আর মানুষের বসতি মানে ক্ষুধার আহার আর রাত্রির মত মাথা গোঁজবার একটু জায়গা। এই দুঃসময়ে অতিথিকে সাধারণত কেউ প্রত্যাখ্যান করে না।

উৎসাহিত হয়ে দ্রুত পা চালিয়ে সেই আলো লক্ষ করে এগোলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন মানুষ আছে সে কথা সত্যি, কিন্তু বসতি যাকে বলে, এ তা নয়। মাঝখানে উজ্জ্বল একটা মশাল জ্বলছে, আর জন কয়েক লোক তার চারদিক ঘিরে বসে পরস্পর (কী) বলাবলি করছে। কাছে আসতেই ওরা তাঁকে দেখতে পেয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল, আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আলবেরুনী দেখলেন তিনি তাদের হাতে বন্দী। এরা যে দস্যু তা বুঝতে কোনোই বেগ পেতে হল না। এরা লুণ্ঠিত মালপত্র নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করছিল।

তাঁকে মাটিতে পেড়ে ফেলে ওরা তাঁর জামাকাপড় তল্লাশি করে দেখল। আত্মরক্ষা করবার কোনো উপায় ছিল না। এদের প্রতিরোধ করবার মত সামান্য ক্ষমতাটুকুও তাঁর নেই সে কথা ওই মশালের আলোর মতই স্পষ্ট। তবু তাঁর মহামূল্য পোঁটলাটিকে বুকের তলায় আঁকড়ে ধরে তিনি উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন। এর মধ্যেই যে তাঁর সব।

এর মধ্যেই তাঁর সব, এটা ওরাও বুঝতে পারল। পোশাক-পরিচ্ছদে নেহাৎ সাধারণ মানুষ বলে মনে হলেও পোঁটলাটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। ওরা পোঁটলাটাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য তাঁকে ধরে টানাটানি করল, লাথি, ঘুষি মারতে লাগল, কিন্তু আলবেরুনী যেমন ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন।

তখন ওদের মধ্যে একজন বলল, দাঁড়াও, ব্যাটাকে মজা দেখাচ্ছি। বলেই সে সেই জ্বলন্ত মশালটা নিয়ে তাঁর পায়ের উপর চেপে ধরল। আর সবাই হি হি করে হেসে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন আলবেরুনী, কিন্তু তবু তিনি তাঁর পোঁটলাটা ছাড়লেন না। দস্যুদলের সর্দার বসে বসে দেখছিল। সে ছুটে এসে মশালটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ওই লোকটার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, এই দুলা মানুষটার কাছ থেকে পোঁটলাটা ছিনিয়ে নিতে পারলি না, এই তোদের তাকত? দলের নাম ডোবালি তোরা।

কিন্তু তিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত ছাড়তেই হল পোঁটলাটা। সর্দার নিজের হাতেই খুলতে লাগল পোঁটলাটা। আর সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। পোঁটলাটা আকারে নেহাৎ ছোট নয়, আর ওজনেও বেশ ভারী। না জানি কত কী আছে ওর মধ্যে। কিন্তু যখন খোলা হল, তখন দেখে সবাই তাজ্জব বনে গেল। দু'একটা কাপড়-চোপড়, আর সব কিতাব। এত আশার পর শেষকালে কিনা এই!

সর্দার হো হো করে হেসে উঠল, হায় হায়, এরই জন্য এত! পাগল না কি হে তুমি? এসব কিতাব দিয়ে কী করব আমরা? এরই জন্য তুমি এত কষ্ট পেলে? আর তুমিই-বা এই বোঝা বয়ে নিয়ে চলছ কেন? এ কোন্ কাজে লাগবে?

তাঁর পায়ের পোড়া জায়গাটায় ভীষণ জ্বালা করছিল। কিন্তু সমস্ত জ্বালা ছাপিয়ে মনের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দস্যু সর্দারের কথায় আশা জাগল, কিতাবগুলি হয়তো হাতছাড়া নাও হতে পারে। আলবেরুনী বললেন, তোমাদের কাছে এর কোন দাম নেই ভাই, এ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু আমার কাছে এর চেয়ে দামি জিনিস এ জগতে আর কিছুই নেই। সেই জন্যই বলি, তোমরা এগুলিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। আল্লাহ্ তোমাদের সুখী করবেন।

কী আছে তোমার এই সমস্ত কিতাবের মধ্যে? দস্যু-সর্দার প্রশ্ন করল। আলবেরুনী উত্তর দিলেন, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখা কয়েকখানা কিতাব এর মধ্যে আছে। আর আমি সে সম্পর্কে যে কিতাব লিখছি তাও আছে।

ও, তুমি আলেম, তুমি কিতাব লেখ? কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা— সেটা আবার কী?

আলবেরুনী ব্যাখ্যা করে বললেন, আকাশে গ্রহ, তারা সব কোন্ নিয়মে চলে, তাদের কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, সেই সব কথাই আমরা প্রমাণ করে দেখাই।

দস্যু-সর্দার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, বটে, তোমাদের আস্পর্ধা তো কম নয়। খোদার হুকুমে সব কিছু চলছে, এইটাই সার কথা। এর উপরে বেশি কিছু জানতে চাওয়া ভাল নয়। তুমি সামান্য মানুষ, খোদা কোন নিয়মে, কেন কী করেন, তুমি তা কী করে বুঝবে? যার যেখানে জায়গা, তার সীমার মধ্যে থাকাই উচিত। তার বাইরে হাত বাড়াতে গেলে অনর্থ ঘটে। নমরুদের কাহিনি জান তো? খোদার উপর খোদকারি করতে গিয়েছিল। শেষকালে কী হল তার ফলটা?

আলবেরুনী এ কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে গেলেন। যুক্তি দিয়ে এদের বোঝানো যাবে না। তার উপর বাদ-প্রতিবাদ করতে গেলে হঠাৎ যদি চটে ওঠে, তখন কিতাবগুলি ফেরত পাবার যেটুকু আশা দেখা দিয়েছে, তাও হয়তো থাকবে না। অতএব চুপ করে থাকাই ভাল।

দস্যু-সর্দার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই তার জীবনদর্শন বর্ণনা করে চলল, হ্যাঁ, যে যেখানে আছ, সেখানেই থাক, নিজের অধিকারের বাইরে পা বাড়িও না, এইটাই হচ্ছে সার কথা। এই-যে দেখছ, আমরা চিরকাল দস্যুবৃত্তি করে আসছি, আমাদের এই পেশা আল্লাই বরাদ্দ করে দিয়েছেন। সেই জন্যই আমরা চাষবাস বা ব্যবসা-বাণিজ্য কোনো কিছুর মধ্যে যাই না। আল্লাহ আমাদের যেই নিয়ম দিয়েছেন, আমরা সেই নিয়ম পালন করে সৎভাবে জীবনযাপন করে আসছি। হ্যাঁ, যার যেখানে জায়গা, তার সেইখানেই থাকা ভাল।

দস্যু-সর্দার এবার থামল। কিন্তু তার কথার উত্তরে ভালমন্দ কোনো কিছু বলছে না দেখে আবার বলল, হুঁ, আমার কথাগুলো বুঝি তোমার মনে ধরছে না? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আলেম মানুষ, তুমি বল দেখি, এই দুনিয়া যা খোদা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার সব খবর তোমার জানা হয়ে গেছে?

আলবেরুনী উত্তর দিলেন—না।

তার কতটুকু খবর জেনেছ তুমি?

অতি সামান্যই।

সে কথা বোঝো তো?

বুঝি বৈ কি।

হুঁ, তবে তার খবর না নিয়ে, যা তোমার নাগালের বাইরে সেই শূন্যের মধ্যে হাতড়ে মরছ কেন?

আলবেরুনী আপনার অজান্তেই তর্কের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বললেন, এই দুনিয়াকে জানতে হলে ওই দূরের গ্রহ-তারাকেও জানতে হয়। এদের প্রভাবেই এই দুনিয়ার ভাল মন্দ অনেক কিছু ঘটছে।

ও তোমার ভুল কথা। আল্লাহ্ তাঁর তখতে বসে সবাইকে চালাচ্ছেন। তাঁর নিয়ম না মেনে কারু উপায় নেই। বল, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারু কোনো শক্তি আছে? কে কার কী করতে পারে?

আলবেরুনী আপনাকে সামলে নিলেন। মনে পড়ল এ ক্ষেত্রে তর্কে নামাটা নিরাপদ নয়, এই সিদ্ধান্তই তিনি নিয়েছিলেন। তিনি আবেদনের সুরে বললেন, আমার ওই কিতাবগুলি, ও তো তোমাদের কোনো কাজে আসবে না—

হ্যাঁ, ও আমাদের কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু তোমার এ সমস্ত কিতাব লিখে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছ, তাদের খোদার পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। এ কাজ তো ভাল নয়।

একজন দস্যু বলে উঠল, সর্দার, তাহলে এই শয়তানী কিতাবগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দি? আলবেরুনী আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, না না না। তাঁর মুখের ভাব দেখে সর্দারের মনে বোধ হয় একটু দয়া জাগল। বলল, থাক, কাজ নেই পুড়িয়ে। আল্লাহর বিচার আল্লাহ্ই করবেন। তাঁর কাজের ধারা এক তিনিই জানেন। আমরা তার কী-ই বা বুঝি!

সেদিন একটুকুর জন্য তাঁর এত সাধের কিতাবগুলি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। বহু কিতাব ঘেঁটে ঘেঁটে যেসব সার-সঙ্কলন করেছিলেন আর স্বাধীনভাবে যেসব রচনা করছিলেন, তাও বাঁচল।

সেই থেকে এই সমস্ত লুণ্ঠনকারী দস্যুদের কথা মনে করে তাঁর পদে পদে আশঙ্কা। প্রাণের জন্য নয়, প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর এই অমূল্য সম্পদের জন্য। তাই কথাটা মনে পড়তেই ভাবলেন, না আর এগিয়ে কাজ নেই। পথ ছাড়িয়ে সামান্য একটু দূরে একটা ঝোপড়া মত গাছ। সেই গাছের তলায় সেদিনকার মত রাত্রিযাপন করলেন।

এটা নতুন কিছু নয়। দেশ ছাড়বার পর থেকে এমন অনেকবার উন্মুক্ত আকাশের নিচে তৃণশয্যা গ্রহণ করতে হয়েছে। আর অনাহার- সে অভিজ্ঞতাও কম নেই।

পরদিন ভোরবেলা পাখির কলকল শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখলেন, এ তিনি কোথায় এসে পড়েছেন! কাল রাত্রির অন্ধকারে মনে হয়েছিল, বুঝি সেই প্রান্তরের মধ্যেই আছেন। এখন দেখলেন প্রান্তরের সীমান্তে

এসে পৌঁছেছেন। দূরে দুটো-একটা ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। সামনে একটা জনপদ আছে, এটা বুঝি তারই লক্ষণ।

ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছিল। এবার প্রাণে একটু বল এল। ওখানে গেলে ক্ষুধার আহার আর বিশ্রামের ঠাঁই মিললেও মিলতে পারে। আর ওখানে গেলে হয়তো জানা যাবে জুরজান এখান থেকে কতদূর। এই জুরজানকে উদ্দেশ্য করে ক্রমাগত দশদিন ধরে হাঁটছেন। যাকে জিজ্ঞাসা করেন সেই বলে, এই তো কাছেই। কিন্তু কোথায় কাছে, পথ আর শেষ হয় না। কে জানে এখানে গেলেও হয়তো সেই কথাই শুনবেন- জুরজান? এই তো কাছেই। সামনে এগিয়ে যাও। এই এগিয়ে যাওয়ার কি আর শেষ নেই? কী আর করা যাবে, যেতে যখন হবেই। তবে এ জায়গাটা ছাড়বার আগে এখানে দুটো দিন জিরিয়ে নিতে হবে। বোঝাটার ওজন বড় কম নয়, পা দুটোও বিশ্রাম চাইছে।

পোঁটলাটা নিয়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাল রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে যেই সমস্যাটা নিয়ে ভাবছিলেন, তার কথা। ভাবতে ভাবতে পথশ্রমে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন মনে পড়ে যেতেই উঠতে গিয়েও ওঠা হল না। পুঁটলিটা খুলে কাগজ-কলম বের করে সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য বসলেন।

বসলেন তো বসলেন, ডুবে গেলেন তাঁর কাজের মধ্যে, আর কোনো কথা মনে রইল না। ভোরের আলোর ছোঁয়া পেয়ে গাছের ডালে ডালে যে পাখিগুলি গান গেয়ে উঠেছিল, তারা খাদ্যের সন্ধানে যে যার দিকে চলে গেল। পূর্বাকাশে দেখা দিল সূর্য, তার কিরণ ক্রমে প্রখর থেকে প্রখরতর হতে লাগল। সূর্যরশ্মি ঘাসের মাথার শিশিরবিন্দুগুলি শুষে নিল, তার উষ্ণ চুম্বনে আতপ্ত হয়ে উঠল পৃথিবী। বেলা বাড়তে লাগল। কিন্তু আলবেরুনীর কোনো দিকে হুঁশ নেই। তিনি অঙ্কের পর অঙ্ক কষে চলেছেন। যেন তাঁর কাছে আর সমস্ত জাগতিক সমস্যা লুপ্ত হয়ে গেছে, আছে শুধু একটিমাত্র সমস্যা। আর সেই সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মুক্তি নাই।

ঘোড়ার খুরের ঘট ঘট শব্দে তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে গেল। সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন অশ্বারোহী। প্রথমেই মনে হন দস্যু, আর কোনো কথা ভাববার মত সময় ছিল না। কিতাবের টিনিটাকে আঁকড়ে ধরলেন তাঁর বুকের মধ্যে। ইতিমধ্যে ওরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। ওরা বলাবলি করছিল, ব্যাটা নির্ঘাত চোর। কিছুদিন ধরে শহরের মধ্যে কেবলই চুরি হচ্ছে। এ সব ওদেরই কাজ। দেখ ওর ওই নিটাকে তল্লাশ করে। অবশ্যই ওর মধ্যে চোরাই মাল পাওয়া যাবে।

কিন্তু আলবেরুনী কিছুতেই তার পুঁটলিটা ছাড়তে চান না। ওদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। ওরা জোর করে পুঁটলিটা ছিনিয়ে নিল। টানাটানিতে কিতাবগুলি খসে পড়ে গেল। এ আবার কী, ওরা হতাশ সুরে বলে উঠল, এ তো চোরাই মাল নয়, এ যে কিতাব।

একজন বলল, সে যাই হোক, এ যে চোর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কে জানে কার কাছ থেকে এই কিতাবগুলি চুরি করে এনেছে। আজকালকার বাজারে কিতাবের দাম আছে। আর আমাদের সুলতান তো কিতাব কিতাব করে পাগল।

আর একজন বলল, আমার কিন্তু মনে হয় এ গুপ্তচর। দেখনি, আমরা যখন এলাম ও বসে বসে কী যেন লিখছিল। ওই যে, ওই সেই কাগজটা। কাগজটা তুলে নিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে ওরা বলল, তাই তো, এর যে সবই সঙ্কেতে লেখা, কিছুই বুঝতে পারছি না। এ গুপ্তচর না হয়ে যায় না।

ওরা তাঁকে ধরে সুলতানের কাছে নিয়ে এল। জুরজানের সুলতান কাবুস্ বিন ওয়াশমগীর। আলবেরুনী বুঝলেন, তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু এভাবে চোর বা গুপ্তচর হিসাবে বন্দী হয়ে আসতে হবে, এটা তাঁর ধারণার অতীত ছিল। তবে জুরজানের সুলতানের সভায় আলেমদের আদর আছে। এইটুকুই যা ভরসা। এই খবরটা জানতে পেরে তবেই তো তিনি জুরজানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এখন দেখা যাক বরাতে কী আছে।

সুলতান প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম?

পথিক উত্তর দিলেন, আবু রায়হান আলবেরুনী।

কী! কী! কী বললে নাম? সুলতান চমকে উঠলেন।

আবু রায়হান আলবেরুনী।

একটু সামলে নিয়ে সুলতান আবার প্রশ্ন করলেন, তোমাকে এখানকার লোক বলে মনে হচ্ছে না। তোমার দেশ কোথায়?

দেশ? আমার দেশ খারিজম্।

খারিজম্? রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। খারিজমের রাজসভায় বিখ্যাত আলেম আবু রায়হান আলবেরুনী আছেন-

সুলতানের মুখের ভাব দেখে আলবেরুনী একটু আশ্বস্ত হলেন। বুঝলেন, তাঁর খ্যাতি এখানেও এসে পৌঁছেছে। তিনি একটু হেসে বললেন, বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে খারিজমের রাজসভার আলেমদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আর খারিজমের রাজসভায় দ্বিতীয় কোনো আবু রাহয়ান আলবেরুনী নেই।